আমার বিদ্যালয়

ঝর্ণা রায়

দশ বছর যাবৎ আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাতর্বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। সিনিয়র ট্রেণ্ড।

এক একটি শিশু এক একটি দেবদূত। নেমে আসে তারা মাটির বুকে এক একটি সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সে চায় জগৎকে জানতে। সে চায় পৃথিবীর সব কিছুকে আস্বাদন করতে। শিশুর চেতন-লোকে যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ছায়া ফেলে যায় তখন তার মন হয় সজীব এবং সজাগ। নিজের অজ্ঞাতেই শিশু যখন আস্বাদ গ্রহণ করতে চায় তার পরিবেশ থেকে তখন তার দরকার সোনার কাঠির স্পর্শ—আর সে সোনার কাঠি হলো একটু স্নেহ, একটু আদর আর একটু উৎসাহ। শিশুমন ব্যাকুল হয়ে থাকে এগুলো পাবার জন্য।

সদ্য ফোটা ফুল গুলোই হবে একদিন জাতির কর্ণধার, জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জীবনে ব্রত নিলাম ফুল ফোটাবার।

ফুল ফোটানর দায়িত্বই সবচেয়ে কঠিন। আর কঠিন বলেই হয়তো সবচেয়ে সুন্দর আর সবেচেয়ে সম্মানজনক।

একটি নির্দিষ্ট দিনে এই জগদ্বন্ধু স্কুলে শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করার অনুমতি পত্র এল, উচ্ছ্বাস ও কম্পনমিশ্রিত হৃদয়ে প্রবেশ করলাম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। একটা প্রশ্ন উঁকি মারলো—পারবো তো এ গুরুভার বহন করতে? উত্তরও পেলাম মন থেকে। না—পারতেই হবে আমাকে। পারবো বলেই তো এসেছি।

কাজে নামবার আগে যাঁর সঙ্গে আমার এই স্কুলে পরিচয় হলো—তিনি হলেন আমাদের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। প্রথম আলাপেই যে মানুষটি আমার হৃদয় জয় করলেন তিনি হলেন ঐ শুভ্রশ্মশ্রু সদাহাস্যময় প্রধান শিক্ষক। পরিচিত হলেম আমি অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা আর এই স্কুলের অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে। ভরে উঠলো হৃদয়।

নামলাম কাজে। আগে শুনেছিলাম, এটা নাকি নামকরা স্কুল। এই স্কুলের প্রত্যেকটি কাজ যাচাই করে দেখলাম। একটা স্কুল 'ভাল' হিসাবে পরিচিত হতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার তা সবই রয়েছে এই বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে। ভালবেসে ফেললাম বিদ্যালয়ের শিশু আর অন্যান্যদের। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বলে গর্ব্ব বোধ করলাম।

দিন চলতে লাগলো। ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বিদ্যালয়ের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরে উঠতে লাগলো বড় বড় শ্রেণীতে। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লো হু হু করে। শিক্ষাগত মানও বাড়ল সেই সঙ্গে।

৫০ বছরে পড়ল আমাদের বিদ্যালয়। উৎসব করতে চলেছি আমরা। এ আমাদের প্রাণের উৎসব। বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক আমাদের এই উৎসবমুখর বিদ্যানিকেতনে।